পরিশিষ্ট : এক

প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)

- সঠীক অনুবাদ
- সাক্ষাৎকার গ্রহণ
- প্রতিবেদন রচনা
- স্বরচিত গল্পলিখন

প্রদত্ত চারটি বিষয়ের মধ্যে যে-কোনো একটি তোমায় বেছে নিতে হবে একাদশ শ্রেণির জন্য। প্রতিটি বিষয়ে আলাদা আলাদা করে বিস্তৃত পরামর্শ, নমুনা (দুটি ক্ষেত্রে) ও নির্দেশিকা দেওয়া হল, তোমাদের বোঝার সুবিধের জন্য। তবে নমুনাগুলি আদর্শ হিসেবে বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করবে। কখনোই আদর্শটিকে অনুকরণ করতে যেয়ো না। প্রকল্পের নির্বাচন থেকে খাতায় চূড়ান্ত রূপদান পর্যন্ত, এর প্রতিটি ধাপেই তোমার স্বকীয়তার প্রতিফলন ঘটবে। তাই নিজের চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনা, সৃষ্টিশীলতা এসবেরই মৌলিক বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চেষ্টা করো প্রকল্পের খাতায়। প্রকল্প তৈরি করার সময় যে-কোনো স্তরে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সক্রিয় সাহায্য ও পরামর্শ নেবে। আবার প্রকল্পের খাতা জমা নেওয়ার সময় শিক্ষিকা/শিক্ষক মহাশয়া মহাশয় তোমার প্রকল্প খুঁটিনাটি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই মূল্যায়ন সম্পূর্ণ করবেন, তাই সে বিষয়ে প্রস্তুত থাকতেও ভুলো না।

প্রকল্প—বিষয় (১) [মূল ভাষা থেকে অনুবাদ করতে হবে। ১০০০-৩০০০ শব্দের মধ্যে। সময়সীমা ৬ মাস। অনুবাদ করা যাবে (ক) প্রবন্ধ, (খ) চিঠি, (গ) সাক্ষাৎকার, (ঘ) ঐতিহাসিক নথি, (ঙ) গল্প এবং (চ) নাটক। লেখক এবং লেখা সম্পর্কে টীকাসহ অনুবাদটি করতে হবে]

সটীক অনুবাদ :

ছোটোবেলা থেকেই আমরা মাতৃভাষায় গল্প, কবিতা, ছড়া, চিঠি অন্যদের কাছে শুনি বা পড়ে থাকি। এরপর আস্তে আস্তে ইংরাজি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষা শিখে যাওয়ার পর, সেই সমস্ত ভাষায় লেখা গল্প, কবিতা প্রভৃতির সঙ্গেও পরিচিত হই। অন্যান্য ভাষায় লেখা সাহিত্যের ভাষার বর্ম ভেদ করতে পারলে, তার ভাব বুঝতে আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না। কেননা চিরায়ত সাহিত্যের আবেদন বিশ্বজনীন। যদিও দেশ-কাল-সমাজ-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ভাষা এসবের ব্যবধান থাকে। কিন্তু সব দেশে সবকালে প্রকৃতির সৌন্দর্য, ব্যাপ্তি এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন-পদ্ধতি ও বেঁচে থাকার আবেগ প্রকাশের অনুভূতিতে এমন এক অন্তর্লীন সামঞ্জস্য রয়েছে, যা ভাষাভেদেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আর এইজন্যই বহুদূর দেশের গল্প, কবিতা বা ছড়া অনায়াসে আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায়, আমাদের আলোড়িত করে। ধরো সকলের জানা এই ছড়াটি—

Twinkle Twinkle little star,

How I wonder what you are!

Up above the World so high

Like a diamond in the sky;

—এ আমাদের বেশ প্রিয়! পড়তে পড়তেই ছোটোবেলার সেই সুর, তাল, লয় যেন মনের মধ্যে আবেশ সৃষ্টি করে। এই আবেশে যদি লিখে ফেলি—‘ঝিকমিক ঝিকমিক ছোট্ট তারা,/তুমি যে কেমন আমি ভেবেই সারা!/ অনেক ওপরে এই পৃথিবী পেরোলে/হিরের টুকরো যেন আকাশে জ্বলে!’ লক্ষ করে দ্যাখো নিজের ভাষায় ওই ছড়াটিকে আমরা আরও নিজের বলে ভাবতে পারি এবং নতুন করে আবিষ্কার করি। এটাই অনুবাদের আনন্দ। অনুবাদ এভাবেই অপেক্ষাকৃত দূরের বিষয়কে আমাদের জন্য সরস, কাছের বিষয়ে রূপান্তরিত করে। আমাদের প্রিয় ও পছন্দের সাহিত্যকীর্তিকে নতুন করে বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এছাড়া অনুবাদের আর একটা দিক হল এর মাধ্যমে অপরিচিত কিংবা স্বল্প পরিচিত অঞ্চল বা দেশের সমাজ-ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। আর এখানেই আসে সটীক অনুবাদের প্রসঙ্গ। সটীক বা টীকাসহ বলতে কী বোঝায়? একটু স্পষ্ট করে বলি।

যে-কোনো ভাষার গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা অর্থাৎ সাহিত্য হল সেই দেশের সমাজ-ইতিহাস ও সংস্কৃতির ফসল। তাই সেই সাহিত্যে এমন অনেক ব্যক্তি, বিষয়, প্রসঙ্গ এসে উপস্থিত হয় যা অনেকেরই অজানা। অনেকক্ষেত্রে আমাদের কাছেও সম্পূর্ণ অপরিচিত। তখন সেগুলিকে স্পষ্ট করে জানার বা বোঝার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের অভিধান ও সহায়ক বইয়ের সাহায্য নিতে হয়। তারপরে আমরা পুরোটা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করতে পারি। যে-কোনো ভালো অনূদিত বইয়ে দেখবে এইসব বিষয়, ব্যক্তি, প্রসঙ্গ সম্পর্কিত শব্দ বা শব্দসমূহের পাশে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা চিহ্নিত থাকে এবং অধ্যায় বা বইয়ের শেষে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাসহ শব্দ বা শব্দসমূহের পাশে সংক্ষিপ্ত বিবরণ

লেখা থাকে। যা পড়ে আমরা অজানা বিষয়গুলি জেনে নিয়ে, স্পষ্ট ধারণা লাভ করি। এইজন্য অনুবাদ সবসময় সঠীক হওয়া প্রয়োজন। সঠীক অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমাদের যা যা করা উচিত—

- মূল থেকে অনুবাদ করার অর্থ, যে ভাষায় গদটি লেখা সেই ভাষাটি আমায় জানতে হবে। সেক্ষেত্রে ইংরাজি, হিন্দি প্রভৃতি আমার জানা ভাষার কোনো পছন্দের গদ্য আমি নির্বাচন করব। তা পাঠ্যবইয়ের হলেও চলবে। গদ্যের অনূদিত অংশ টীকাসহ ন্যূনতম শব্দসংখ্যা যেন পূরণ করে।
- দীর্ঘ রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে তাকে সংক্ষিপ্ত করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে সুষ্ঠু সম্পাদনার প্রয়োজন। যাতে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে মূল ভাবের বিকৃতি না ঘটে বা অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট না হয়। তাই এ সমস্যা এড়ানোর জন্য পরিমিত আয়তনের গদ্য নির্বাচন করাই শ্রেয়।
- মাধ্যমিক স্তরে বঙ্গানুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) করায় তোমরা মূল ভাষা থেকে আক্ষরিক অনুবাদ কিংবা ভাবানুবাদ করার ব্যাপারটি জানো। এই স্তরে যেহেতু সাহিত্যের অংশ অনুবাদ করতে হবে, তাই মূলের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা যেমন জরুরি, তেমনই ভাবনার বিশুদ্ধতা রক্ষা করার প্রতিও সচেতন থাকতে হবে। আমরা চেষ্টা করব এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে।
- প্রতিটি ভাষার নিজস্ব বিশিষ্টতা, সৌন্দর্য ও মাধুর্য আছে। তা অন্য ভাষার থেকে আলাদা। তাই যে কোনো ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার সময় আমরা বাংলা ভাষার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য অনুসারেই অনুবাদ করব।
- প্রাথমিকভাবে যে ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করব, সেই ভাষায় লেখা কিছু ছড়া বা টুকরো গদ্যের অংশ অনুবাদ করে বিষয়টিকে রপ্ত করব। এইভাবে কিছুদিন চর্চা করে শিক্ষিকা/শিক্ষকের পরামর্শ নেব। প্রয়োজনীয় ভুল-ত্রুটি শুধরে নেব। তারপর আমার নিজের নির্বাচিত পছন্দের গদ্যাংশ অনুবাদে হাত দেব। প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন অভিধানের সহায়তা নেব। প্রথম খসড়া তৈরি করে শিক্ষিকা/শিক্ষককে (মূল রচনাটি সহ) দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ নেব। এইভাবে পরিমার্জনের মধ্যে দিয়ে চূড়ান্ত খসড়া তৈরি হবে।
- প্রথম খসড়া তৈরি করার সময়েই অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত বিষয়, ব্যক্তি বা প্রসঙ্গের সংখ্যাসহ তালিকা প্রস্তুত করে নেব। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বই ও অভিধানের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তৈরি করব। যা টীকার আকারে অনুবাদের শেষে যুক্ত করতে হবে। একইসঙ্গে মূল ভাষায় লেখাটি যে লেখকের তাঁরও পরিচিতি দিতে হবে।
- সবসময়ে সব অনুবাদের ক্ষেত্রেই বিস্তৃত টীকার প্রয়োজন ঘটে না। তাই টীকার বিষয়ে শিক্ষিকা/শিক্ষকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
- অনুবাদটি যেন সরস ও সুপাঠ্য হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। একই সঙ্গে মূল পাঠের বিশুদ্ধতাও বজায় রাখতে হবে। এই দুটি গুণ রক্ষিত হলে অনুবাদ হবে সার্থক এবং অনুবাদক ও পাঠকের কাছে আনন্দদায়ক।

- প্রকল্পের খাতায় মূল ভাষার পাঠটির পাতার পাশেই থাকবে অনূদিত পাঠের পাতা। আর শেষে লেখক পরিচিত এবং প্রাসঙ্গিক টীকা সমূহ। প্রথমে কোনো সংক্ষিপ্ত ভূমিকার প্রয়োজন হলে (শিক্ষিকা/শিক্ষকের বিবেচনা অনুসারে) তাও লিখতে হবে। ভূমিকায় গদ্যটি নির্বাচনের কারণ, গদ্যের বিষয় প্রভৃতি দিক-নির্দেশ থাকতে পারে।
- তোমাদের বোঝার আরও সুবিধার জন্য মূল পাঠ-সহ এমনই দুটি গদ্যের সটীক অনুবাদ তোমাদের জন্য দেওয়া হল—

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক G. K. Chesteston-*এর 'ON LYING IN BED' প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্ত ও সম্পাদিত মূল লেখাটি প্রথমে রইল এবং তার পরে এই অংশের বাংলা অনুবাদ।*

G. K. Chesterton

ON LYING IN BED

Lying in bed would be an altogether perfect and supreme experience if only one had a coloured pencil long enough to draw on the ceiling. ... To that purpose, indeed, the white ceiling would be of the greatest possible use; in fact it is the only use I think of a white ceiling being put to.

But for the beautiful experiment of lying in bed I might never have discovered it. For years I have been looking for some blank spaces in a modern house to draw on. ... I examined the walls; I found them to my surprise to be already covered with wall-paper, and I found the wall-paper to be already covered with very uninteresting images. ... Everywhere that I went forlornly with my pencil or my paint brush, I found that others had unaccountably been before me, spoiling the walls, the curtains, and the furniture with their childish and barbaric designs.

* * * *

Nowhere did I find a really clear space for sketching until this occasion when I prolonged beyond the proper limit the process of lying on my back in bed. ... I am sure that it was only because Michaelangelo was engaged in the ancient and honourable occupation of lying in bed that he ever realised how the roof of the Sistine Chapel might be made into an awful imitation of a divine drama that could only be acted in the heavens.

Misers get up, early in the morning and burglars, I am informed, get up the night before. It is the great peril of our society that all its mechanism may grow more fixed while its spirit grows more fickle. A man's minor actions and arrangements ought to be free, fiexible, creative; the things that should be unchangeable are his principles, his ideals. But with us the reverse is true; our views change constantly; but our lunch does not change. Now, I should like men to have strong and rooted conceptions, but as for their lunch, let them have it sometimes in the garden, sometimes in bed, sometimes on the roof, sometimes in the top of a tree. ... A man can get used to getting up at five o'clock in the morning. A man cannot very well get used to being burnt for

his opinions; the first experiment is commonly fatal. Let us pay a little more attention to these possibilities of the heroic and the unexpected. I dare say that when I get our of this bed I shall do some deed of a almost terrible virtue.

For those who study the great art of lying in bed there is one emphatic caution to be added. Even for those who can do their work in bed (like journalists), still more for those whose work cannot be done in bed (as, for example, the professional harpooners of whales), it is obvious that the indulgence must be very occasional. But that is not the caution I mean. The caution is this: if you do lie in bed, be sure you do it without any reason or justification at all. I do not speak, of course, of the seriously sick. But if a healthy man lies in bed, let him do it without a rag of excuse; then he will get up a healthy man.

বিছানায় শুয়ে থাকা প্রসঙ্গে

জি. কে. চেস্টারটন[১]

সিলিঙে ছবি আঁকার জন্য যদি একটা রঙিন, লম্বা পেনসিল থাকতো, তাহলে বিছানায় শুয়ে থাকাই হয়ে উঠতো সবচেয়ে নিখুঁত এবং উচ্চমানের অভিজ্ঞতা।... এভাবেই ছাদের সাদা সিলিঙকে সবচেয়ে আনন্দময় করে তোলা যায়, আর সত্যি বলতে গেলে; সিলিঙের ব্যবহারিক সম্ভাবনা একমাত্র এটাই বলে মনে হয়।

আমার যদিও বিছানায় শুয়ে থাকার আমুদে অভিজ্ঞতা না থাকলে, আমি এই সত্য আবিষ্কার করতে পারতাম না। তাই বেশ কিছু বছর ধরে ছবি আঁকার জন্য, আমি একটি নতুন বাড়ির ফাঁকা দেয়াল খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। দেয়ালগুলো পেয়ে খুঁটিয়ে দেখে অবাক হলাম সব ইতিমধ্যেই অজস্র আকর্ষণ-হীন সচিত্র কাগজের আস্তরণে ঢাকা পড়েছে।... সর্বত্র আমি অভাগার মতো তুলি পেনসিল নিয়ে গিয়ে দেখি, আমার আগেই অন্যেরা দেয়াল, পর্দা, আসবাব এইসব নিজেদের শিশুসুলভ ও অসভ্য কারুকার্যে ভরিয়ে সম্পূর্ণ নষ্ট করে বসে আছে।

*　　*　　*　　*

সত্যিই কোথাও আমি ছবি আঁকার একটা প্রকৃতই পরিষ্কার জায়গা খুঁজে পেলাম না যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজের বিছানায় শুয়ে থাকার যে সময়সীমা, সেটাকে আরও দীর্ঘায়িত করলাম।... এবার আমি নিশ্চিন্ত হলাম মাইকেল অ্যাঞ্জেলো[২] শুধুমাত্র বিছানায় শুয়ে থাকার মতো আদিম এবং সম্মানীয় পেশার সঙ্গে জড়িত থাকার ফলেই উপলব্ধি করেছিলেন, কীভাবে সিস্টিন চ্যাপেলের[৩] ছাদটাকে স্বর্গীয় নাটক কিংবা স্বর্গেই ঘটতে পারে এমন সম্ভাবনাময় নাটকের জন্য ব্যবহার করা যায়।

কিপটেরা খুব সকালেই ঘুম থেকে ওঠে, আবার শুনেছি চোরেরা নাকি উঠে পড়ে রাত থাকতেই। আমাদের সমাজের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক এটাই সামাজিক ব্যবস্থাগুলি যতই দৃঢ় হয়, সমাজ-মানস ততই অস্থির হতে থাকে। মানুষের এইসব তুচ্ছ কার্য-কলাপ এবং তার বিন্যাস মুক্ত, নমনীয় এবং সৃষ্টিশীল হওয়াই উচিত, বরং যা অপরিবর্তনীয় তা হলো মানুষের নীতি ও আদর্শ। কিন্তু সাধারণত এর উল্টোটাই ঘটে। তাই আমাদের দুপুরের খাওয়ার সময়ের কোনো বদল ঘটে না অথচ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলি প্রতিনিয়তই বদলে যায়। তবে আমি অবশ্যই চাই মানুষের ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির শেকড় যাতে গভীর এবং সুদৃঢ় হয়, বরং তাঁরা দুপুরের খাবার, কখনও বাগানে বা বিছানায় কিংবা ছাদে; আবার কখনও গাছের মগডালে চেপেও সারতে পারে।... একজন

মানুষ অনয়াসে ভোর পাঁচটায় ওঠা অভ্যেস করতে পারে। কিন্তু একজন মানুষ কখনই নিজের মতামতের জন্য আগুনে পুড়ে যাওয়া অভ্যেস করতে পারে না, কেননা এ বিষয়ে প্রথম পরীক্ষাই তার মরণোন্মুখ শেষ পরীক্ষায় পর্যবসিত হবে। এবার কিছু অপ্রত্যাশিত ও নায়কোচিত সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাক তাহলে। আমার মনে হচ্ছে; আমি এই বিছানা থেকে উঠে পড়লে সাংঘাতিক ভালো কিছু করে ফেলতে পারি।

এখন যাঁরা বিছানায় শুয়ে থাকা নামক মহৎ শিল্পে মনোনিবেশ করতে চান, তাঁদের উদ্দেশে একটি জোরালো সাবধানবাণী সংযোজন করা প্রয়োজন। এমনকি সেইসব মানুষেরা যাঁরা বিছানায় থেকেও নিজেদের কাজ করতে পারেন (যথা সাংবাদিককুল), যাঁরা বিছানায় থেকে কোনোভাবেই কাজ করতে পারেন না (তথা হারপুন চালিয়ে সমুদ্রে শিকার করেন যাঁরা); স্পষ্টতই তাঁদের কদাচিৎ এই প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঠিক এ ধরনের সাবধানবাণী আমি শোনাতে চাইছি না। সাবধানবাণীটি হলো এরকম : যদি অকারণ বিছানায় শুয়ে থাকো, সেটাকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ করতে যেও না। অবশ্যই খুব অসুস্থ মানুষদের কথা আমি এখানে বলছি না। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কোনো সুস্থ সবল মানুষ বিছানায় শুয়ে থাকার পেছনে যদি কোনো ফালতু অজুহাত খাড়া না করে, তাহলে সে স্বাস্থ্য সমেত তাঁর শয্যা ত্যাগ করে।

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. [লেখক পরিচিতি] জি. কে. চেস্টারটন : (জন্ম : লন্ডন ২৯ শে মে ১৮৭৪, মৃত্যু ১৪ই জুন ১৯৩৬) ইংরাজি সাহিত্যের একজন কৃতী লেখক। এছাড়া সাংবাদিকতাও করেছেন। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস সবেতেই সমান দক্ষ। আর্থার কোনান ডয়েলের সঙ্গে পাশ্চাত্যে গোয়েন্দা গল্পের প্রথম রূপকারদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর গোয়েন্দা গল্প-মালা-ফাদার ব্রাউন নামক এক পাদ্রিকে ঘিরে, যা এখনও জনপ্রিয়। সমালোচকদের মতে চেস্টারটনের লেখায় স্প্যানিশ লেখক সার্ভান্ত ও ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের প্রভাব আছে। 'The innocence of Father Brown', 'The ballad of white horse' তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই।

২. মাইকেল অ্যাঞ্জেলো : (জন্ম ১৪৭৫, মৃত্যু ১৫৬৪) কালজয়ী ইতালিয়ান শিল্পী ও ভাস্কর। রেনেসাঁর সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ইতালির বিভিন্ন জায়গায় তাঁর তৈরি ভাস্কর্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। 'পিয়েতা', 'ব্যাকাস', 'ম্যাডোনা অ্যান্ড দ্য চাইল্ড', 'ডেভিড' প্রভৃতি ভাস্কর্যগুলি আজও আমাদের বিস্মিত করে। সিস্টিন চ্যাপেলের ছাদে তিনি বাইবেলের কাহিনি এঁকেছেন, যা দেখতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ এখনও রোমে যান।

৩. সিস্টিন চ্যাপেল : রোমের ভ্যাটিকান সিটিতে অবস্থিত ছোট্ট খ্রিস্টীয় ভজনালয়। এটি ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। এর ছাদে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো বাইবেলের কাহিনি এঁকেছিলেন। এছাড়াও অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পীদের অলঙ্করণও সিস্টিন চ্যাপেলের দেয়ালে আছে।

৪. হারপুন : সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি শিকার করার জন্য ব্যবহৃত বর্শার মতো ধারালো অস্ত্রবিশেষ।

হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার মুন্সি প্রেমচন্দের **'বড়ে ভাই সাহব'** *গল্পটির মূল লেখার সঙ্গে রইল তার বাংলা অনুবাদ।*

बड़े भाई साहब

—मुन्सी प्रेमचन्द

मेरे भाई साहब मुझसे पाँच साल बड़े थे, लेकिन केवल तीन दरजे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरु किया था; जब मैंने शुरु किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसन्द न करते थे। इस भवना की बुनियाद को खूब मजबूत बनाना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। एक साल का काम दो साल में करते थे। कभी-कभी तीन साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने ?

मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र नौ साल की थी, वह चौदह साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा, जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून सो समझूँ।

वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तसवीरें बनाया करते थे। कभी-कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य दस बीस बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार-बार सुन्दर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द-रचना करते, जिसमें न कोई सामंजस्य होना। मसलन एक बार उनकी कापी पर मैंने यह इबारत देखी—स्पेशल, अमीना, भाइयों-भाइयों, दरअसल, भाई-भाई, राधेश्याम, श्रीयुत् राधेश्याम, एक घंटे तक-इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का अर्थ निकालूँ लेकिन असफल रहा, और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह नवीं जामात में थे, मैं पांचवीं में। उनकी रचनाओं को समझाना मेरे लिए छोटे मुँह बड़ी बात थी।

मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ सा था। मौका पाते ही होस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिला तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़ कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार, उसे आगे-पीछे चलाते हुए मोटरकार का आनंद उठा रहे हैं; लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देख कर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता-कहाँ थे ? हमेशा यह सवाल उसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुँह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्द में मेरा सत्कार करें।

'इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, तो जिन्दगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आयेगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हँसी-खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो राम गैरा नत्थू खैरा भी सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ दिन-रात आँखें फोड़नी पड़नी है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं। और क्या है कहने आ जाती है। बड़े-बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने धोंधा हो कि मुझे देख कर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आँखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कुसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कुसूर है। इतने मेले-तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा ? रोज ही क्रिकेट और हाँकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता। हमेशा पढ़ता हूँ। उसपर भी एक-एक दरजे में दो-दो-तीन साल पड़ा रहता हूँ, फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यों खेल-कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओगे ? मुझे तो दो-तीन साल लगते हैं। तुम उम्र भर इस दरजे

में पड़े सढ़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवाँनी है, तो बेहतर है, घर चले जाओ, मजे से गुल्ली-डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपये क्यों बरबाद करते हो ?

मैं यह लताढ़ सुनकर आँसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था अपराध तो मैनें किया, लताढ़ कौन सहे ? भाई-सहब उपेदश की कला में निपुण थे। ऐसी'-ऐसी लगती बात कहते, युक्ति-बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े-टुकड़े हो जाते और हिम्मत टुट जाती। इस तरह, जान लगा कर मेहनत करने की शक्ति मैं करने न पाता था। और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता-क्यों न घर चला जाऊँ। जो काम मेरे बूते से बाहर है, उसमें हाथ डाल कर क्यों अपनी जिन्दगी खराब करूँ। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और इरादा कहता कि आगे खूब जी लगा कर पढूँगा। चटपट एक टाइम-टेबिल बना डालता। बिना पहले से नक्शा बनाये, कोई स्कीम तैयार किये, काम कैसे शुरु करूँ ? टाइम-टेबिल में खेल-कूद की मद बिलकुल उड़ जाती। प्रात: काल उठना, छ:बजे मुँह-हाथ धो, नाशता कर पढ़ने बैठ जाना। छ: से आठ तक अंग्रेजी, आठ से नौ तक हिसाब, नौ से साढ़े नौ तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। साढ़े तीन बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, चार से पाँच तक भूगोल, पाँच से छ: तक ग्रामर, आधा घंटा होस्टल के सामेन ही टहलना, साढ़े छ: हिन्दी, दस से ग्यारह तक विविध विषय, फिर विश्राम।

मगर टाइम-टेबिल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरु हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के-हल्के झोंके, फुटबाल की उछल-कूद, कबड्डी दाव-घात, वाली-बाँल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम-टेबिल वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फ़जीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भगाता, उनकी आँखों से हटने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बन्धन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल-कूद का तिरस्कार न कर पाता।

বড়দা

মুন্সি প্রেমচন্দ[১]

আমার দাদা আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো, কিন্তু পড়েন মাত্র তিন ক্লাস উপরে। তিনিও সেই বয়সে পড়া শুরু করেন, যখন আমি করি। কিন্তু বিদ্যার্জনের মহত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি তাড়াহুড়োর পক্ষপাতী নন। যার উপর তাঁর আকাশচুম্বী প্রসাদ দাঁড়াবে, সেই ভাবনার ভিতটিকে তিনি খুব শক্ত করে নিতে চান। এক বছরের কাজ তিনি দু'বছরে সারতেন। কখনো কখনো তিন বছরও নিতেন। ভিত মজবুত না হলে বাড়ি টেকসই হবে কী করে?

আমি ছোটো, বয়স ন'বছর, তিনি বড়ো বয়স চৌদ্দ। আমার বিষয়ে খেয়াল রাখা এবং নানা ব্যাপারে সাবধান করার পুরো অধিকার তাঁর ছিল। আর আমার ভদ্রতা ও সজ্জনতা এমনই ছিল, তাঁর আদেশকে আইন বলে মান্য করতাম।

তিনি প্রচুর পড়াশুনা করতেন। সব সময় বই খুলে বসে থাকতেন। সম্ভবত মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেবার জন্য কখনো খাতায় কখনো বইয়ের পাতার মার্জিনে পাখি, কুকুর, বেড়াল প্রভৃতির ছবি আঁকতেন। কখনো একটি নাম, একটি শব্দ অথবা বাক্য দশ-বিশ বার করে লিখে ফেলতেন। কখনো বা একটি শ্লোক সুন্দর অক্ষরে বার বার নকল করতেন। মাঝে মাঝে এমন বাক্য রচনাও করতেন যাতে না থাকত কোনো অর্থ আর না সামঞ্জস্য। উদাহরণ স্বরূপ—একবার তাঁর খাতায় লেখা পেলাম—'সাশাল, আমিনা, ভাই ভাই, দরঅসল (বাস্তবে), রাধেশ্যাম, শ্রীযুক্ত রাধেশ্যাম একঘণ্টা ধরে'—তারপর একজন মানুষের ছবি আঁকা। আমি অনেক চেষ্টা করেছি এই ধাঁধার রহস্য ভেদ করার, কিন্তু পারিনি। আর তাকে জিজ্ঞাসা করতেও সাহসে কুলোয়নি। তিনি নবম শ্রেণির ছাত্র, আর আমি মাত্র পঞ্চমের।

তাঁর লেখার অর্থোদ্ধার আমার পক্ষে ছোটো মুখে বড়ো কথার সামিল। পড়াশুনায় আমার মন একেবারে বসতো না। বই নিয়ে ঘন্টা খানেক বসাও পাহাড় মনে হতো। সুযোগ পেলেই হস্টেলের বাইরে, মাঠে চলে যেতাম, কখনো কাঁকড় ছুঁড়তাম, কখনো কাগজের প্রজাপতি ওড়াতাম। কোনো বন্ধু পেয়ে গেলে তো কথাই নেই।—কখনো পাঁচিলে চেপে লাফাচ্ছি, কখনো গেটের সোয়ার হয়ে সামনে-পিছনে মোটর হাঁকিয়ে কানের আনন্দ লাভ করছি। কিন্তু কামরায় ঢুকে দাদার সেই রুদ্ররূপ দেখে প্রাণ শুকিয়ে যেত। তাঁর প্রথম প্রশ্নই হতো—''কোথায় ছিলে?'' সর্বদা এই প্রশ্নটি এই ধ্বনিতে উচ্চারিত হতো। আর তার জবাব হতো আমার মৌনতা। জানি না কেন আমার মুখ থেকে এটুকুও বেরতো না,—''বাইরে একটু খেলছিলাম।'' আমার মৌনভাবে বলে দিত যে, ''আমার অপরাধ স্বীকার করছি।'' স্নেহ ও রাগ মিশিয়ে আমাকে আদর করা ছাড়া দাদার কাছে আর কোনো ওষুধও ছিল না। ইংরেজি পড়লে সারাজীবন পড়তেই থেকে যাবে, অক্ষর পরিচয়ও হবে না। এইভাবে ইংরেজি পড়া কোনো হাসি তামাশা নয় যে, যার ইচ্ছা হবে সেই শিখে নেবে। তাহলে তো রাম-শ্যাম-যদু-মধু সবাই ইংরেজিতে পণ্ডিত হয়ে যেত। দিন রাত চোখের পরিশ্রম ও রক্ত জল করতে হয়, তবে গিয়ে এ বিদ্যা আয়ত্ত হয়, আয়ত্ত কি হয়! হ্যাঁ, বলার মতো হয়ে যায়। বড়ো বড়ো পণ্ডিতও শুদ্ধ ইংরেজি লিখতে পারেন না। বলা তো দূরের থাক। বলতে বাধ্য হচ্ছি তুমি কেমন আহম্মক যে আমাকে দেখেও শিখছো না। আমি যে কত পরিশ্রম করি তা তো তুমি নিজের চোখেই দেখছো, যদি না দেখো তো তোমার চোখের দোষ, তোমার বুদ্ধির দোষ। এতো মেলা হয়, তামাশা হয়, আমাকে কখনো কোথাও যেতে দেখেছো? ক্রিকেট ও হকির ম্যাচ তো লেগেই আছে। আমি পাশ দিয়েও যাই না। সব সময় পড়তে থাকি। তবুও এক এক ক্লাসে দু তিন বছর পড়ে থাকি। তা সত্ত্বেও তুমি কী করে আশা কর যে এইভাবে খেলাধুলো করে সময় কাটিয়ে পাশ করতে পারবে? আমার তো দু তিন বছরই লাগবে তুমি জীবনভোর এই ক্লাসেই পড়ে থাকবে। যদি তুমি এইভাবে জীবন কাটাতে চাও তো ভালো হয়—তুমি বাড়ি চলে যাও আর মনের আনন্দে ডাঙ্গুলি খেলো গিয়ে। বাবার কঠিন শ্রমে আয় করা টাকা কেন নষ্ট করছো? এই তিরস্কার শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। জবাব আর কী ছিল? অপরাধ করেছি আমি, বকুনি খাবে কে? দাদা ছিলেন উপদেশ দানের শিল্পে সুদক্ষ। এমন সব খোঁচাভরা কথা বলতেন, এমন এমন যুক্তিবাণ নিক্ষেপ করতেন যে আমার হৃদয়টা খান-খান হয়ে যেত। সব উৎসাহ ফুরিয়ে যেত। তাঁর মতো প্রাণপাত করে পড়াশুনার শক্তি আমার ছিল না, সেই নৈরাশ্যের মুহূর্তে মনে হতো বাড়ি চলে গেলেই হয়। যে কাজ আমার শক্তির বাইরে, তাতে হাত দিয়ে নিজের জীবন কেন নষ্ট করি। বরং মূর্খ থাকায় আমার সায় ছিল, কিন্তু ঐরকম পরিশ্রম? নৈব নৈব চ। আমার তো মাথা ঘুরে যেত। ঘণ্টা দু-ঘণ্টার পর নিরাশার মেঘ কেটে যেত, আমি নিশ্চিত করে নিতাম যে এবার খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করবো।

চটপট একটি রুটিন তৈরি করে নিতাম। প্রথমে কোনো খসড়া তৈরি না করে, কোনো স্কিম তৈরি না করে কাজ শুরু করবো কী করে? রুটিনে খেলা-ধুলার কোনো স্থান থাকত না। ভোরে উঠে ছ'টার মধ্যে হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে পড়তে বসে যাওয়া; উঠে ছ'টা থেকে আটটা পর্যন্ত ইংরেজি, আটটা থেকে নয়টা গণিত, নয়টা থেকে সাড়ে নয়টা ইতিহাস, তারপর আহার ও বিদ্যালয়। সাড়ে তিনটেতে স্কুল থেকে ফিরে এসে আধ ঘন্টা বিশ্রাম। চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ভূগোল, পাঁচটা থেকে ছয়টা গ্রামার, আধঘণ্টা হোস্টেলের সামনে পায়চারি। সাড়ে ছয়টা থেকে সাতটা পর্যন্ত ইংরেজি কম্পোজিশন, তারপর আহার করে আটটা থেকে নয়টা পর্যন্ত অনুবাদ। নয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত হিন্দি। দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত বিবিধ বিষয়। তারপর বিশ্রাম।

কিন্তু রুটিন তৈরি করা এক এবং তা মেনে চলা আর। প্রথম দিনই তার অবহেলা শুরু হয়ে যেত। মাঠের মনোরম শ্যামলিমা, বাতাসের স্নিগ্ধ মধুর স্পর্শ, ফুটবলের লাফালাফি, হাডুডু-র মারপ্যাঁচ, ভলিবলের সেই গতিপূর্ণ স্ফূর্তি—আমাকে অজ্ঞাত এবং অনিবার্যভাবে টেনে নিয়ে যেত। সেখানে পৌঁছেই আমি সবকিছু ভুলে যেতাম। সেই প্রাণঘাতী রুটিন, সেই চোখ নষ্ট করা বই—কোনো কিছুই মনে থাকত না। আর তার ফলে বড়দাও তিরস্কার এবং উপদেশ দানের সুযোগ পেয়ে যেতেন। আমি তাঁর সঙ্গ এড়িয়ে চলতাম, তাঁর দৃষ্টি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতাম। ঘরে এমনভাবে পা-টিপে টিপে ঢুকতাম যেন টের না পান। তিনি চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেই আমার প্রাণ উড়ে যেত। মনে হতো যেন একটা খোলা তলোয়ার সব সময় মাথার ওপর ঝুলছে। তা সত্ত্বেও যেমন মৃত্যু ও বিপদের মাঝখানেও মানুষ মায়া ও মোহের বন্ধনে জড়িয়ে থাকে আমিও তিরস্কার ও শাসানি সহ্য করেও খেলাধুলো চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

(কৃতজ্ঞতা : রামবহাল তেওয়ারি)

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. [লেখক পরিচিতি] মুন্সি প্রেমচন্দ : (জুলাই ৩১, ১৮৮০—অক্টোবর ৮, ১৯৩৬) প্রকৃত নাম ধনপৎরাই শ্রীবাস্তব। প্রথমে লিখতেন 'নবাব রাই' নামে, পরে প্রেমচন্দ নামে লিখে খ্যাতি পান। জন্ম বেনারসের কাছে লম্‌হি গ্রামে। উল্লেখযোগ্য রচনা 'গোদান', 'সদ্‌গতি', 'শতরঞ্জ কী খিলাড়ী', 'কর্মভূমি' প্রভৃতি।

প্রকল্প—বিষয় (২) [লোকায়ত আঙ্গিক/সাহিত্য/রাজনীতি/ক্রীড়া/নাচ/গান/কলাক্ষেত্রের যে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের (অন্তত জেলাস্তরে পরিচিতি থাকতে হবে) সাক্ষাৎকার নিতে হবে। অন্তত ২০টি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে হবে।]

সাক্ষাৎকার গ্রহণ :

সাধারণভাবে আলাপ-আলোচনা আর সাক্ষাৎকার কিন্তু এক নয়। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে উপযুক্ত ও যথাযথ প্রস্তুতিসহকারে স্পষ্ট কোনো উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ আলাপচারিতাকেই আমরা 'সাক্ষাৎকার' বলে থাকি। উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট মানুষদের সাক্ষাৎকার মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হলে বা দৃশ্য শ্রাব্য মাধ্যমে সম্প্রচারিত হলে সাধারণ মানুষের কৌতূহল বিবৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্য এবং তাঁদের বিশ্লেষণ সম্পর্কেও তাদের ধারণাও তৈরি হয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সমাজ, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, খেলাধূলা বিভিন্ন বিষয়েই সাক্ষাৎকার

থেকে নানান দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত পাওয়া যায়। মূলত সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করেই একজন সাংবাদিক ও তাঁর সংবাদটি গড়ে তোলেন, কেননা এটাই হলো তথ্য অনুসন্ধানের প্রকৃষ্ট পথ। সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব সাংবাদিক/সাক্ষাৎকারগ্রহীতার কথা বলার দক্ষতা ও কৌশল, প্রশ্নকরণে পটুত্ব, মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান, ধৈর্যশীলতা, মানব চরিত্র বোঝার ক্ষমতা, প্রসঙ্গ-অনুসারী আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্পৃহা ও সক্ষমতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ধীরস্থির মানসিকতা, আস্থা অর্জনের ক্ষমতা, একই সঙ্গে যাচাইয়ের ক্ষমতা, প্রয়োজনে গুরুত্ব বা ধরন অনুযায়ী সাক্ষাৎকারকে সংবাদ সাক্ষাৎকার, মতামত সাক্ষাৎকার, ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার, সম্প্রদায়গত সাক্ষাৎকার কিংবা সাংবাদিক সম্মেলন বা আলোচনাভিত্তিক সাক্ষাৎকার—ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে। সাক্ষাৎকারদাতার অনুমতি নিয়ে সাক্ষাৎকার প্রার্থীকে সাক্ষাৎকারের স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করতে হয়। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে রেকর্ডার অথবা লিখিত প্রশ্নাবলি থাকা আবশ্যিক। মনে রাখতে হবে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা না করে সাক্ষাৎকারদাতাকে কথা বলতে উৎসাহিত করাই একজন প্রকৃত সার্থক সাক্ষাৎকার প্রার্থীর কাজ।

শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব তাঁদের নিজগুণে আমাদের আকৃষ্ট করেন। তাঁরা সাহিত্য, সিনেমা, নাচ, গান, নাটক, খেলা প্রভৃতি নানান ক্ষেত্রের মানুষ। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই নিষ্ঠা, প্রতিভা ও সাধনার বলে স্ব স্ব ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ এবং উদ্ভাসিত করে থাকেন। তাই এঁদের জীবন-সৃষ্টিশীলতা-দক্ষতা আমাদের ভাবায়, ভালো লাগায়, আলোড়িত করে আর তাঁদের সম্পর্কে কৌতূহলী করে তোলে। এই সমস্ত মানুষদের ছোটোবেলার কথা, সেই সময়কার পরিবেশ, জীবনের চমকপ্রদ বিভিন্ন ঘটনা, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে নিজের প্রস্তুতি ও প্রতিভার বিকাশ সম্পর্কে বিশদে জানতে পারলে আমরা বিস্মিত হই। আর যে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের এইসব বিশিষ্ট নানা দিক নিয়েই গড়ে ওঠে সাক্ষাৎকার।

সাক্ষাৎকার মানেই সাক্ষাৎকার-দাতা এবং সাক্ষাৎকারীর খোলামেলা আলাপচারিতা। কথায় কথায় স্বনামধন্য সেই মানুষটির ভেতরে লুকিয়ে থাকা অসাধারণত্বগুলোকে আবিষ্কারের চেষ্টা। তাই একদিকে কারও সাক্ষাৎকার নেওয়া মানে যেমন সেই মানুষটাকে আবিষ্কার করা, ঠিক তেমনই সাক্ষাৎকারীর মনেও থাকা উচিত আবিষ্কারের আনন্দ। আর যে কোনো সার্থক সাক্ষাৎকারে এই গুণ দুটি আমাদের কখনই চোখ এড়ায় না। সুতরাং, কারও সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে কয়েকটি বিষয়ে সচেতন থেকে আমরা নিজেদের তৈরি করে নেব—

- সাক্ষাৎকার-দাতা যে ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত, সেই বিষয়ে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা গড়ে নেওয়া। অর্থাৎ কোনো ফুটবলারের সাক্ষাৎকার নিতে হলে ফুটবল খেলা বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা জরুরি। একইভাবে গায়িকা/গায়কের সাক্ষাৎকার নিতে হলে গান সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান না থাকলে চলবে না।

- যে ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেব তাঁর সম্পর্কে নির্দিষ্ট 'হোম-ওয়ার্ক' সেরে নেওয়া। 'হোম-ওয়ার্ক' কীভাবে করব? সেই ব্যক্তির কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা, পরিচিত হওয়া। ধরা যাক কোনও লোকশিল্পীর সাক্ষাৎকার নেব, তিনি মৃৎশিল্পী হলে তাঁর হাতের কাজগুলি দেখা, তাঁর স্বাতন্ত্র্য বুঝতে চেষ্টা করা, জীবনের অন্যান্য দিক সম্পর্কে আগাম খোঁজখবর নেওয়া। আবার কবি বা লেখকদের ক্ষেত্রে তাঁদের লেখা বইগুলি পড়া, প্রবহমান ধারার নিরিখে তাঁর সৃষ্টিশীলতার বৈশিষ্ট্য বুঝতে চেষ্টা করা। এছাড়াও সেই ব্যক্তির অন্যান্য সাক্ষাৎকার পড়া। যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং কথোপকথনে নতুনত্ব আসে। তবে মনে রাখা উচিত আমরা আমাদের জানা বিষয়ের সঙ্গে জড়িত, প্রিয় ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার নিতেই পছন্দ বোধ করি।

- এই প্রস্তুতি-পর্ব শেষ হলে, সাক্ষাৎকারের জন্য একটা প্রশ্নমালা তৈরি করে ফেলা প্রয়োজন। প্রশ্নমালা অনুসারেই কথায় কথায় আলাপচারিতা জমে উঠবে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে প্রশ্নমালা যেন কখনই কথোপকথনের সাবলীলতাকে নষ্ট না করে, তাই পরিস্থিতি অনুসারে প্রশ্নমালায় রদ-বদল ঘটাতে হতে পারে। কেননা সমস্ত প্রশ্নের উত্তরের পরিবর্তে এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের মানবিক ও সৃষ্টিশীল নানা দিকগুলিকে আবিষ্কার করাই সাক্ষাৎকারীর প্রধান উদ্দেশ্য।

- একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবসময় মাথায় রাখতে হবে, প্রাঞ্জল ভাষায় পুরোটা লেখার সময় সাক্ষাৎকার-দাতার বক্তব্য বা মতামত যেন কখনই বিকৃত না হয়।

- একইভাবে সাক্ষাৎকার-পর্ব সমাধা হলে দুটি খাতায় দুটি নমুনা তৈরি করে, একটি বিদ্যালয়ে জমা দাও আর একটি নিজের সংগ্রহে রাখো।

  তোমাদের বোঝার আরও সুবিধার জন্য বিখ্যাত দু'জন মানুষের সাক্ষাৎকারের এমনই (দুটি) নমুনা রইল তোমাদের জন্য।—এমন হতে পারে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিত্ব হয়ত তোমার জেলায়/এলাকায় নেই। কিন্তু কৃতী, গুণী, কর্মচঞ্চল এমন মানুষ আছেন যাঁর সাধনা, প্রতিভা ও কর্মকুশলতা অন্য কারো চেয়ে কম নয়। এখন তুমিই হতে পারো তাঁর সাক্ষাৎকার-প্রার্থী।

- সাক্ষাৎকার-দাতা যদি একাদিক্রমে গান, গল্প, নাটক, কবিতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পারঙ্গম হন; অর্থাৎ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব হন, সেক্ষেত্রে কোনও বিশেষ দিক বা বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রশ্নমালা তৈরি করে আলাপচারিতা চালানো সহজ ও সমীচীন হবে। নয়তো কথায় কথায় নানা বিক্ষিপ্ত বিষয় এসে পড়লে কথাবার্তা এলোমেলো হয়ে যায়, সাক্ষাৎকার দিশাহীন হয়ে পড়ে।

একটি নমুনা সাক্ষাৎকার : ক্রীড়া সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্যের মুখোমুখি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

‘স্পোর্টস মানে কখনও ধুলো; কখনও রক্ত, কখনও ট্রফি’—**সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

কলকাতা, এপ্রিল, ২০১০

(আই পি এলে চরম বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে ইন্টারভিউটা নেওয়া। তখন চিপকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হেরে অসহনীয় হয়ে পড়েছে নাইটদের অবস্থা। সেই সময় চেন্নাই-কলকাতা আকাশপথে বাংলা নববর্ষের আগের বিকেলে পাওয়া গেল বিষণ্ণ সৌরভকে।)

গৌতম : চিদাম্বরমের জন্য একটা ইংরেজি অভিব্যক্তি এখন বাজারে খুব চলছে। ‘হোয়্যার ডাজ দ্য বাক স্টপ’? চূড়ান্ত দায়িত্বটা কার? নাইটদের হারের জন্য দায়িত্ব কে নেবেন?

সৌরভ : আমাদেরই নিতে হবে। ক্যাপ্টেনকে নিতে হবে। টিমকে নিতে হবে। বিশেষ করে ক্যাপ্টেন হিসেবে আমাকেই ঘাড়ে নিতে হবে। জিতলে প্রশংসা যদি নিতে পারি, হারলে সমালোচনাটাও নিতে হবে।

গৌতম : শাহরুখ বলেছেন, হারের সমস্ত দায় তাঁর। ‘টুইট’-এ লিখেছেন, দায়ভার সব তিনি গ্রহণ করলেন।

সৌরভ : না, না শাহরুখ নেবে কেন? ও তো খেলেনি। দায়ভার নিচ্ছি আমরা। খেলেছি তো আমরা। ও তো মাঠে নামেনি।

গৌতম : হারতে হারতে ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলি ব্র্যান্ডটায় মরচে পড়ে যাচ্ছে না? ভয় হচ্ছে না সেই পালিশটা ঘষটে যাবে?

সৌরভ : স্পোর্টস মানে সারাক্ষণ ট্রফিতে পালিশ করা নয়। স্পোর্টস হল জীবন। সত্যিকারের জীবন। যেখানে ধুলো আছে, দৌড় আছে, ঘাম আছে, গায়ে কালিমাখা আছে। আবার ট্রফি জেতাও আছে। দু’টোর সঙ্গেই মানাতে হবে।

আপনি যদি মনে করেন শুধু ট্রফি হাতে তুলবেন, সম্ভব নয়। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে সারাক্ষণ। কখনও পড়বেন। কখনও রক্তাক্ত হবেন। আবার কখনও জিতবেন। আমিও তাই। চেষ্টা করে যাচ্ছি। হয়তো এ বার পারিনি। কখনও হয়তো পারব। আজ হয়নি, কাল হবে।

গৌতম : কিন্তু নাইট সামর্থকেরা তো অধৈর্য হয়ে পড়ছেন। তিন বছর ধরে প্রতীক্ষায় তাঁরা। টিমটা সেমিফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারছে না।

সৌরভ : প্রথম বছর টিম ভালো ছিল না। গত বছরের গল্প জানেন। নতুন করে বলার দরকার নেই। এ বার আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক ছিল। প্রস্তুতি হয়েছিল। টিম ঠিক হয়েছিল। ট্রেনিং যথেষ্ট ছিল। পরিবেশ ঠিক ছিল। রিজার্ভ বেঞ্চ ভালো ছিল। আমি ভাবতেই পারিনি এ বার ব্যর্থ হব।

অথচ বড়ো ম্যাচগুলোতে আমরা খেলতেই পারিনি। এটাই জীবন। সব সময় যা চাইবেন তা পাবেন না।

গৌতম : বাইরে সাতটা ম্যাচ খেলে এ বার কে কে আর-এর ফল ১-৬। মোহালি ছাড়া সর্বত্র হেরেছে। ব্যাখ্যা কী?

সৌরভ : বোর্ডে যথেষ্ট রান তুলতে পারিনি।

গৌতম : মানসিক কোনও ভীতি কাজ করেছে?

সৌরভ : পারিনি। আসল আসল ম্যাচগুলোতেই হেরে গিয়েছি। টুর্নামেন্টে এগোতে হলে আপনাকে বড়ো ম্যাচগুলো জিততে হবে।

গৌতম : অতীতে ভারত অধিনায়ক থাকার সময় ব্যাটসম্যান গাঙ্গুলি অনেক সময় ক্যাটেন গাঙ্গুলিকে উতরে দিয়েছে। অরেঞ্জ ক্যাপে আপনি তিন নম্বরে অথচ সেটা হল না কেন?

সৌরভ : ওই যে বললাম, আসল আসল খেলাগুলো হেরে গিয়েছি।

গৌতম : আপনার হিতৈষীরা অনেকে মনে করছেন, এই ফর্ম্যাটে আরও খেলা চালিয়ে গেলে আপনি নিজের সুনামের প্রতি চরম অবিচার করবেন। অবসর নেওয়াটা যেমন গৌরবজনক হয়েছিল সেই রোশনাই চলে যাবে।

সৌরভ : আমি মনে করি না। নিরাপদ আর সহজ থেকে জীবন চালানোটা আমার কাছে স্থিতাবস্থা। সে তো করাই যায়। আমি সে ভাবে ভাবি না। বহু বছর আগে আপনি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, পাকিস্তান যাচ্ছেন। পাকিস্তান থেকে তো কোনও ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন জিতে ফেরেনি। তাঁদের মতো ফিরে এসে আপনার অধিনায়কত্বও না চলে যায়।

আমি বলেছিলাম, ও ভাবে ভাবছিই না। গ্রেগ চ্যাপেলের সময় যখন সাউথ আফ্রিকায় কামব্যাক করলাম, আমায় ভালোবেসে এক ফটোগ্রাফার বলেছিল, তোকে যদি ওখানে না ফিরিয়ে ইন্ডিয়ায় খেলাত ভালো হতো। ওরে বাবা সাউথ আফ্রিকার মাঠ! আমি বলেছিলাম, ওখানে তো কী? রান পাওয়ার হলে সাউথ আফ্রিকাতেই পাব।

আপনারা কেউ কেউ বলেছেন, গত বছরই কেন টি-টোয়েন্টি থেকে রিটায়ার করলাম না? এই পর্যায়ের ক্রিকেটে আমার পক্ষে রান করা সম্ভব নয়। এ সব শুনে তো ছেড়েই দিতে পারতাম। কী দরকার ছিল ঝুঁকির মধ্যে যাওয়ার। কিন্তু যদি ছাড়তাম, নিজেকে কি টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটসম্যান হিসেবে এ ভাবে প্রমাণ করতে পারতাম?

গৌতম : আপনি যাই বলুন, নাইট সমর্থকেরা কিন্তু একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

সৌরভ : আমি জানি ওঁরা খুব হতাশ হয়েছেন। তা হলে এবার আমাদের কথা ভাবুন। আমাদের—প্লেয়ারদের কী মনের অবস্থা। টিমের সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে তাদের কী করুণ পরিস্থিতি।

গৌতম : অতঃপর কী হবে?

সৌরভ : কী আবার হবে? পরের দু'টো ম্যাচ জেতার চেষ্টা করতে হবে। যাতে সম্মান নিয়ে শেষ করা যায়।

গৌতম : এই কথাটাই খুব ট্র্যাজিক নয়?

সৌরভ : ট্র্যাজিক মুহূর্ত বলে স্পোর্টসে কিছু নেই। প্রত্যেকটা ব্যর্থতাই হতাশজনক মুহূর্ত। যেটা আপনাকে শেখায়, আপনি যথেষ্ট ভালো ছিলেন না। আবার সেটাই ধাক্কা দিয়ে সোজা করে দেয়। বুঝিয়ে দেয় পরের দিন আপনাকে যথেষ্ট ভালো হতে হবে।

গৌতম : নিজের ভাবমূর্তি নিয়ে ভাবছেন না? সেটা গোল্লায় যাচ্ছে কি না?

সৌরভ : কীসের ভাবমূর্তি? স্পোর্টস কি ভাবমূর্তি রক্ষার ডিজাইনিং নাকি? স্পোর্টস আপনাকে শেখায় ব্যর্থতা নিয়ে পড়ে না থাকতে। প্রতি বার যখন মাঠে নামবেন প্রতিদিন নিজের না পারাগুলোকে পিছনে ফেলে নামবেন। আমার ধারণা সব সফল লোকেরাই তাই করেন। ব্যর্থতার কথা ভেবে নামেন না।

কোম্পানি মনে করুন আপনাকে ওয়াঘা সীমান্তে কভার করতে পাঠাল। প্রথম দিন স্টোরি পেলেন না। দ্বিতীয় দিন স্টোরি পেলেন না। তো তৃতীয় দিন কি এডিটরকে ফোন করবেন? যে, না আমি পারব না। নাকি কামড়ে পড়ে থাকবেন! স্টোরি আসবেই। আজ না হোক কাল।

গৌতম : ভারতীয় দলেও এভাবে ভাবতেন?

সৌরভ : নিশ্চয়ই। জীবনেও এভাবে ভাবি। আমি জানি সব সময় সফল হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে কী হবে? লর্ডস টেস্টে সেদিন খেলতে নামার সময় যদি আমি ভাবতাম, এই রে উইকেটকিপারের হাতে ক্যাচ চলে যেতে পারে, তা হলে লাইফের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরিটাই হত না। জীবনে যদি ব্যর্থ হওয়ার এত ভয় থাকে আপনার দ্বারা কিছু হবে না। কোনো ম্যাচে কভার ড্রাইভ মারতে গিয়ে আউট হয়েছিলেন পরের দিনও যদি ভাবেন, না বাবা কভার ড্রাইভ মারব না তা হলে চলবে কী করে? আপনাকে ভাবতে হবে কভার ড্রাইভ মারব। আজ রান হবে। স্পোর্টস তাই।

গৌতম : তা হলে আপনি আই পি এল চেষ্টা চালিয়ে যাবেন?

সৌরভ : নিশ্চয়ই। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তো দু'বছর ধরে কিছু জিততে পারেনি। শচিন তো রান পাচ্ছিল না। তাতে কি হাল ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসেছিল? মাঠেই তো ফেরত এল। মাঠেই তো প্রমাণ করল। আমিও সেভাবে দেখি। প্রত্যেকটা ব্যর্থতাকে আমি মনে করি নতুন চ্যালেঞ্জ। আমরা ব্যর্থ হয়েছি ঠিকই। একই সঙ্গে আমরা সুযোগ পাচ্ছি পরেরবার ব্যর্থতাটা শুধরে নেওয়ার।

(কৃতজ্ঞতা : গৌতম ভট্টাচার্য)

সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি সত্যজিৎ রায়

পরম পথিক সত্যজিৎ রায়

(আলংকারিক ও প্রচ্ছদ শিল্পী হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের নিজের মতামত আমরা এই সাক্ষাৎকারে পড়ব)

সঞ্জীব : আপনি ছিলেন চিত্রশিল্পী। শান্তিনিকেতনে আপনি প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর কাছে চিত্রাঙ্কন শিখেছেন। জীবন শুরু করেছেন চিত্রশিল্পী হিসেবে।

সত্যজিৎ : আমি ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিলাম; কিন্তু আমি যে চিত্রশিল্পী হব, সেটা আমার মাথায় ছিল না। আঠারো বছর বয়েসে বি এ পাশ করার পর, অত তাড়াতাড়ি চাকরির কথা ভাবতে চাইনি, আর আমার মায়ের একটা অনেক দিনের শখ ছিল যে আমি শান্তিনিকেতনে যাই, রবীন্দ্রনাথ তখনও বেঁচে, তাঁর সান্নিধ্যে কিছুটা কাল কাটিয়ে আসি। কলাভবনে নন্দলালবাবুর কাছে আঁকাটা শিখে আসি। আমি নিজে চিত্রশিল্পী হবার কথা কোনওদিনই ভাবিনি। আমি ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিলুম, বিশেষ করে আর্ট হিস্ট্রি সম্পর্কে, আমাদের শিল্পের পশ্চাৎপটটা কী, সেই জ্ঞান সংগ্রহের ভয়ানক একটা ইচ্ছে আমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যায়। আমাদের

ট্র্যাডিশানটা কী। ফাইন আর্টস শেখার ইচ্ছে আমার ছিল না। আর্টের লাইনে যেতে হলে আমি কমার্শিয়াল আর্টকেই বেছে নিতাম; কিন্তু আমি জানতাম, আমাদের আর্টের ট্র্যাডিশানটা জানা থাকলে আমার সুবিধে হবে। আমার কাজ আরও সহজ হবে। এই ভেবেই আমার শান্তিনিকেতনে যাওয়া। শান্তিনিকেতনের পাঁচ বছরের কোর্স, আমি আড়াই বছর থেকে চলে আসি। রবীন্দ্রনাথ তো মারাই গেলেন। আমরা থাকতে থাকতেই। আর আমিও নন্দলালবাবুকে, মাস্টারমশাইকে বললুম যে, মাস্টারমশাই আমি তো কমার্শিয়াল আর্টের দিকে যাব, আর এখানে তো কমার্শিয়াল আর্ট শেখানো হয় না, এখানে ফাইন আর্টস শেখানো হয়, আর সেই ফাইন আর্টসের মোটামুটি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমার হয়ে গেছে, আমি তাহলে এইবার একটা চাকরির ব্যবস্থা দেখি কলকাতায় গিয়ে। মাস্টারমশাই সে কথা শুনে রাজিও হলেন। তার মানে আমি আমার কোর্সের মাঝামাঝি সময়ে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় চলে এলাম। কলকাতায় এসে বেশিদিন আমাকে বসে থাকতে হয়নি। আমি ছ মাসের মধ্যে চাকরি পেয়ে গেছি, বিজ্ঞাপনের আপিসে। ডি জে কিমারের এজেন্সিতে। একেবারে জুনিয়ার আর্টিস্ট হয়ে ঢুকি। সেখান থেকে বেশ মোটামুটি চটপট উন্নতি করে, আমি শেষটায় বছর সাতেকের মধ্যেই আর্ট ডিরেক্টার হয়ে গিয়েছিলাম। তা এই তো হলো গিয়ে ঘটনা।

সঞ্জীব : চিত্রকলায় সেই সময় আপনি একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। তাই নয় কি?

সত্যজিৎ : করেছিলাম, সেটা তোমার ওই ইন্ডিয়ান ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। শান্তিনিকেতন থেকে আমি ক্যালিগ্রাফি শিখে এসেছিলাম। তাছাড়া বিজ্ঞাপনে কী ভাবে ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশান ঢোকানো যায় সে চেষ্টা আমি করেছিলাম। ফলে আমার কাজের চেহারা একটু অন্যরকমের হতো।

সঞ্জীব : তাহলে দেখুন, যে কাজেই আপনি হাত দিয়েছেন সেই কাজেই আপনার প্রতিভার স্পর্শ লেগেছে। ছবি আঁকা তো একটা ভয়ঙ্কর রকমের প্রাণের জিনিস, নেশার জিনিস, সেই সময় আপনার করা বইয়ের মলাট একটা আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল।

সত্যজিৎ : হ্যাঁ। বইয়ের মলাট। সেটা অবশ্য একটা আলাদা ব্যাপার, ওর সঙ্গে আমার বিজ্ঞাপন আপিসের কোনও যোগ ছিল না। দিলীপকুমার গুপ্ত আমাদের বিজ্ঞাপন, আপিসের অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার ছিলেন, তিনিই করলেন সিগনেট প্রেস। তাঁর অনুরোধেই আমি বইয়ের মলাটের কাজ করতে শুরু করি। আর বইয়ের ব্যাপারটা যখন আরম্ভ হলো, তখনই আমি এই যে ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশান বা শান্তিনিকেতনের ট্র্যাডিশান, সেই ট্র্যাডিশান আমি বইয়ের মলাটে প্রয়োগ করলাম, যা আগে কখনও হয়নি। সেই রকম কয়েকটা নতুন জিনিস আমি দিতে সক্ষম হয়েছিলাম।

সঞ্জীব : আচ্ছা, এ কথা কি আমি বলতে পারি, আপনি বইয়ের মলাটে হাত দেবার আগে বাংলা প্রকাশন জগৎ বইয়ের মলাট ঠিক কী হওয়া উচিত তা জানত না।

সত্যজিৎ : না, একধরনের ডিগনিফায়েড কাজ হতো বিশ্বভারতীর বইয়ের মলাটে। রবীন্দ্রনাথের বই ছাপার ব্যাপারে বিশ্বভারতী বিশেষ যত্ন নিতেন। তবে হ্যাঁ, সেখানেও যে সেন্‌সে আমি বইয়ের মলাট শুরু করেছিলাম, সে সেন্‌সে কিছু ছিল না।

সঞ্জীব : সে তো হতো একেবারেই প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। কোরা জমির ওপর লেখা।

সত্যজিৎ : হ্যাঁ, হ্যাঁ। তার ওপর লেখা। মাঝে মাঝে জাপানি ধরনের ছবি বা রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা দিয়ে মলাট করা হতো। পরিশেষ, সঞ্চয়িতা, শেষের দিকের কিছু বই।

সঞ্জীব : সে খুবই কম।

সত্যজিৎ : খুবই কম। সে বেশি না।

সঞ্জীব : কিন্তু আপনি যখন বইয়ের মলাটের জগতে এলেন।

সত্যজিৎ : আমি যখন বইয়ের মলাটের জগতে এলাম; তখন আমি বোধ হয় একটা, মলাট যে তখন হতো না তা নয়, কিন্তু মলাটে তখন এত যত্ন নেওয়া হতো না। মলাটের পেছনে তখন এত চিন্তা হতো না। সেটা আমরা দিয়েছি।

সঞ্জীব : আপনার জীবনের সবচেয়ে উত্তীর্ণ, সবচেয়ে হিট মলাট বোধ হয়, সেই নামাবলীর ডিজাইন দিয়ে।

সত্যজিৎ : পরমপুরুষ।

সঞ্জীব : আজ্ঞে হ্যাঁ, পরমপুরুষ, মনে পড়ছে?

সত্যজিৎ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ, সেটা আমার মনে আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তখন আমার মাথা খুলে গেছে। তখন আমি নানা রকম জিনিস করছি। কবিতার বইয়েও আমি নানা রকম জিনিস করেছি। জীবনানন্দের বইতে করেছি, বিষ্ণু দে-র বইয়ে করেছি। সুধীন দত্তের বইয়েতে করেছি। একটার পর একটা, একটার পর একটা কাজ করে গেছি। কাজ হতোও প্রচুর। সিগনেট তখন কবিতার বইয়ের একটা বাজার তৈরি করেছিল। তার আগে তো কবিতার বই বিশেষ বিক্রি হতো না। সিগনেট আসার পর থেকেই কবিতার বইয়ের কাটতি বেড়েছিল। ফলে আমাকেও কাজ করতে হতো প্রচুর। প্রচুর কাজ করেছি; এবং তার মধ্যে ভালো কাজ নিশ্চয় কিছু বেরিয়েছে।

সঞ্জীব : তখন আপনার জীবনের দুটো দিক।

সত্যজিৎ : বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের একটা দিক।

সঞ্জীব : আর একটা হলো বইয়ের মলাট, প্রকাশনার।

সত্যজিৎ : হ্যাঁ, বইয়ের মলাটের একটা দিক, প্রকাশনার দিক।

সঞ্জীব : ভেতরের ইলাস্ট্রেশানও অনেক করেছেন।

সত্যজিৎ : ভেতরের ইলাস্ট্রেশনও অনেক করেছি, অনেক সময় করেছ।

সঞ্জীব : আপনার জীবনের এই পিরিয়ডটা কত বছরের?

সত্যজিৎ : তা দশ থেকে বারো বছর তো হবেই। বারো বছর বলা যেতে পারে; কারণ নাইনটিন ফর্টি থ্রিতে আমি চাকরিতে ঢুকি, নাইনটিন ফর্টি ফোর, ফর্টি ফাইভ থেকে আমি সিগনেটের কাজ আরম্ভ করি। নাইনটিন ফিফটি ফাইভ পর্যন্ত আমি ডি জে কিমারের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এবং তারপরে... তারপর তো আমার ছবির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। পথের পাঁচালি হয়ে গেছে। নাইনটিন ফিফটি টুতে পথের পাঁচালি হয়েছে। পথের পাঁচালি শেষ হয়েছে ফিফটি ফাইভে এবং মুক্তি পেয়েছে। সেই সময় আমি বিজ্ঞাপনের কাজটা ছেড়ে দি। বিজ্ঞাপনের কাজের ওপর খুব একটা আস্থা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম, আমার ভালো লাগত না কারণ, বিজ্ঞাপন করতে গেলেই, ওই একটি 'ক্লায়েন্ট' নামক বস্তুর সম্মুখীন হতে হয়, এবং তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী জিনিসটাকে তৈরি করতে হয়। ওইটাই আমার ভালো লাগত না। আমার যেটা মনে হয়েছিল, যে আমি স্বাধীনভাবে কাজ করব, আমি যেটা করব সেটার ওপর আর কেউ খবরদারি করবে না।

সঞ্জীব : কলম চালাবে না।

সত্যজিৎ : কলম চালাবে না বা কোনও রকম হুকুম জারি করবে না।

সঞ্জীব : ফর্টি থ্রি আর ফিফটি ফাইভ।

সত্যজিৎ : ফিফটি ফাইভ, ফিফটি ফাইভে পথের পাঁচালি ভালো চলার পর আমি ডি জে কিমারের চাকরি ছেড়ে দি।

সঞ্জীব : ফর্টি থ্রিতে আপনার বয়েস কত ছিল?

সত্যজিৎ : বাইশ।

সঞ্জীব : বাইশ আর ফিফটি ফাইভ, তার মানে বারোটা বছর। বারো বছরে এত সব ঘটে গেল। তারপর সিগনেট প্রেসে মনে হয় নানা রকম গোলমাল হয়ে গেল।

সত্যজিৎ : সিগনেটে তো তারপরেই সব গোলমাল হয়ে গেল।

সঞ্জীব : তার মানে যেখানে আপনি সবচেয়ে ভালোবেসে কাজ করতেন, সেই জায়গাটা গেল।

সত্যজিৎ : হ্যাঁ। সেই জায়গাটা গেল; কিন্তু ততদিনে আমার ফিল্ম আরম্ভ হয়ে গেছে।

সঞ্জীব : ফিল্ম আরম্ভ হয়ে গেছে এবং নতুন হরাইজন খুলে গেছে।

সত্যজিৎ : একেবারে।

সঞ্জীব : আচ্ছা আপনি যখন ছবি করার কথা ভাবলেন, পথের পাঁচালি, তখন নিশ্চয় চিন্তা করেছিলেন, কেন পথের পাঁচালি! কেন অন্য বই নয়! আপনি বারে বারেই বলেছিলেন, আপনার উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ।

সত্যজিৎ : উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ বটেই, তবে সেটা পথের পাঁচালির বেশ কিছু আগে। সে হল ফর্টি এইট, ফর্টি নাইনের কথা। তখন আমি ঘরে বাইরের কথা চিন্তা করেছি।

সঞ্জীব : পথের পাঁচালি কী ভাবে আপনার নির্বাচনে এল?

সত্যজিৎ : পথের পাঁচালির চিন্তা এল ছবি আঁকতে গিয়ে। সত্যি কথা বলতে কী, পথের পাঁচালি আমি তখনও পড়িনি। সত্যিই পড়িনি। যখন ছবি আঁকর প্রশ্নটা উঠল। সিগনেট প্রেস পথের পাঁচালির একটি কিশোর সংস্করণ আম আঁটির ভেঁপু নাম দিয়ে বার করার সিদ্ধান্ত নিল। ছবি আঁকার ভার পড়ল আমার ওপর। আমার যদ্দুর মনে পড়ছে, দিলীপ গুপ্ত সজনীকান্ত দাসকে দিয়ে ছোটোদের মতো করে লেখালেন, আর আমাকে বললেন, ছবি আঁকতে। সেই ছবি আঁকার জন্যে পুরো পথের পাঁচালিটা আমাকে পড়তে হলো। পড়তে হয়েছিল মানে এই নয় যে একটা দায়িত্ব নিয়ে পড়া।

সঞ্জীব : মানে ছবি করব বলে সিরিয়াসলি পড়া।

সত্যজিৎ : না, তা না, বেশ আনন্দ নিয়েই পড়েছিলাম, আর পড়তে পড়তেই মনে হয়েছিল, এ থেকে খুব ভালো একটা ছবি হয়।

সংক্ষেপিত

(কৃতজ্ঞতা : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়)

প্রকল্প বিষয়—৩ [ছ'মাসের দৈনিক সংবাদপত্রের খেলার পাতার কাটিং সংগ্রহ এবং তার ভিত্তিতে নিজের দেশ বা রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে উত্থান-পতন বিশ্লেষণ করে অবস্থান মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন লিখতে হবে। ন্যূনতম শব্দ সংখ্যা ১০০০।]

প্রতিবেদন রচনা :

প্রতিবেদন সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা তোমাদের আছে। কেননা এই বিষয়টির সঙ্গে তোমরা মাধ্যমিক স্তরেই পরিচিত হয়েছ। সাধারণত দৈনিক সংবাদপত্রের জন্য লিখিত হওয়ায় প্রতিবেদনের একটি নির্দিষ্ট গঠন-কৌশল আছে। আর তা তোমাদের জানা। তোমরা অনেকেই নিয়মিত সংবাদপত্রের খেলার পাতা পড়ো। এবার আমরা সংবাদপত্রে প্রকাশিত এইসব খেলার প্রতিবেদনের সাহায্যেই আমাদের প্রকল্প প্রতিবেদনটি তৈরি করব। কীভাবে? ধাপে ধাপে এগোন যাক।

- প্রথমে স্থির করে নিতে হবে কোন্ খেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে আমার প্রতিবেদন। আমাদের প্রত্যেকেরই এক বা একাধিক খেলার প্রতি আগ্রহ, আকর্ষণ রয়েছে। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, সাঁতার, অ্যাথলেটিক্স, টেনিস, দাবা, ভলি নানা রকম। এক্ষেত্রে যে খেলার নিয়মকানুন আমি জানি এবং নিজেও খেলেছি এমন খেলা নির্বাচন করাই হবে বাঞ্ছনীয়। আর একই সঙ্গে ঠিক করে নিতে হবে সেই খেলায় পশ্চিমবঙ্গ নাকি ভারতবর্ষের উত্থান-পতন নিয়ে আমি প্রতিবেদন লিখব।

- ধরা যাক আমি ভারতীয় ক্রিকেট, ভারতীয় টেনিস, ভারতীয় হকি কিংবা বাংলার ফুটবল, বাংলার সাঁতার, বাংলার টেনিস এমন কিছু একটা বেছে নিলাম। (মহিলা বা পুরুষ যে কোনও একটা বিভাগ নিয়েই কাজ করা যাবে।)

- নির্বাচন পর্ব শেষ হলে, আমরা পরের ধাপের কাজে হাত দেব। লক্ষ্য করে দেখা যাবে জাতীয় পর্যায়ের কোনো প্রতিযোগিতা হোক, বিশ্ব ক্রম পর্যায়ের কোনো প্রতিযোগিতা হোক, দুই বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক দেশের কোনো প্রতিযোগিতা বা সিরিজ যাই হোক না কেন, মূল পর্যায়ের খেলা শুরু হওয়ার আগে প্রতিটি রাজ্য বা দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতিপর্ব থাকে। সংবাদপত্রে নিয়মিত এইসব প্রস্তুতি শিবিরের খবর বেরোয়। নিজের দেশ বা রাজ্যের প্রস্তুতি, অনুশীলন, কোচ, অধিনায়ক, খেলোয়াড় এবং অন্যান্য সাহায্যকারী ব্যক্তির মতামত যেমন বেরোয় তেমনই প্রতিপক্ষ শিবিরেরও একইরকম খবর বেরোয়। আমরা নিয়মিত সংবাদপত্র থেকে নিজের নির্বাচিত খেলা ও দলের (রাজ্য/ দেশ) এই খবরগুলির কাটিং সংগ্রহ করে প্রকল্পের খাতার জন্য সংগ্রহ করব। এবং সংবাদপত্রের সন-তারিখ-সহ আটকাব। এর সাহায্যে খেলা শুরু হওয়ার আগে উভয় পক্ষের মানসিকতা, অবস্থা, রণকৌশল সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠবে।

- এরপর খেলা শুরু হওয়ার পরে রোজ সাংবাদিকদের বিশ্লেষণ-সহ বিস্তারিত ম্যাচ রিপোর্ট সংগ্রহ এবং তা প্রকল্পের খাতায় আটকানোর পালা। এখানে একক কিংবা দলগত যে ধরনের খেলাই হোক না কেন খেলোয়াড় বা খেলোয়াড়দের অবদান, নৈপুণ্য, চাপের মুহূর্তে না হারার মানসিকতার প্রতিফলন প্রভৃতি বিষয়গুলি ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে। আবার দলগত খেলার ক্ষেত্রে দলীয় সংহতি, দলগত প্রচেষ্টা, অধিনায়কের নেতৃত্বদানের গুণাবলি ও দক্ষতার সঙ্গে অন্যান্য খেলোয়াড়দের

ব্যক্তিগত নিষ্ঠা, ত্যাগ ও নৈপুণ্যের দিকগুলি সংবাদপত্রের পাতায় যেভাবে প্রকাশিত হবে; তাও জোগাড় করে খাতার মধ্যে জুড়ে দিতে হবে।

- একইসঙ্গে মনে রাখতে হবে সাম্প্রতিককালে সব খেলার ক্ষেত্রেই কোচ, ক্রীড়া মনোবিদ, ফিজিওথেরাপিস্ট, চিকিৎসক, প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং অন্যান্য সাপোর্ট স্টাফদের মতামত-পরামর্শ-সাক্ষাৎকার, খেলা চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রের পাতায় বেরোয়। এখনকার খেলায় এগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনও সফল খেলোয়াড় বা জয়ী দলের সাফল্যের পেছনে এঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমার নির্বাচিত খেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই ধরনের মানুষদের বিবৃতি, মতামত, সাক্ষাৎকার কিংবা কলাম দেখলে তাও সংগ্রহ করব।

- এই সমস্ত কাটিং সংগ্রহ করার সময় কোনও বিশেষ ম্যাচ বা খেলোয়াড় সম্পর্কে যদি তোমার কোনও ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ থাকে, যা হয়ত সংবাদপত্রে পেরোয়নি, তা আলাদা কাগজে ম্যাচের নাম-তারিখসহ লিখে রাখতে পারো। যা তোমার চূড়ান্ত প্রতিবেদন লেখার সময় ব্যবহার করলে প্রতিবেদনে অভিনবত্ব আসবে।

- প্রকল্পের খাতাটি কেমন হবে—

✓ নির্বাচিত খেলার নাম।

✓ নিজের দেশ/রাজ্য (কী নির্বাচন করেছ?)

✓ বিগত ছ'মাসের সেই খেলার তালিকা। (যেখানে দেশ/রাজ্য অংশগ্রহণ করেছে)।

✓ প্রথম থেকে খেলা অনুসারে প্রস্তুতি পর্ব—ম্যাচের বিবরণ—ফলাফল—বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মতামত/সাক্ষাৎকার—এসবের এক বা একাধিক সংবাদপত্রের কাটিং (পাতার ওপরে সংবাদপত্রে নাম-তারিখ-সহ) পরপর সাজিয়ে ছ'মাসের গতিপ্রকৃতি ফুটিয়ে তোলা।

[প্রয়োজনে কিংবা খাতার সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খেলায় সফল খেলোয়াড়দের ছবিও দিতে পারো]

✓ এইভাবে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্পের খাতাটি তৈরি হয়ে গেলে চোখের সামনেই নিজের দেশ/রাজ্যের ওই সময়কাল জুড়ে উত্থান কিংবা পতনের অর্থাৎ ক্রীড়া মানচিত্রে তার গতি-প্রকৃতির রেখাচিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

✓ এবার খাতায় ব্যবহৃত পেপার কাটিংগুলির নিরিখে, খাতার শেষে সহজ সরল ভাষায় উপযুক্ত শিরোনামসহ নিজের নামে প্রতিবেদনটি লিখে ফেলব।

প্রকল্প বিষয় — ৪ [বিদ্যালয় জীবনের কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে (মৌলিক) এক বা একাধিক স্বরচিত গল্প লিখতে হবে।]

স্বরচিত গল্প লিখন :

মানুষের গল্প শোনার আগ্রহ চিরকালীন। আমরা প্রায় সকলেই গল্প শুনতে ও বলতে ভালোবাসি। সত্যি কথা বলতে যে কোনো ভারী বিষয় গল্পের ছলে বলা হলে আমাদের সহজ লাগে। কেননা গল্পের সঙ্গে মানুষের জীবনের সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের প্রতিদিনকার নানা ঘটনায়, বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় কতো গল্প লুকিয়ে থাকে। আবার রোজ হয়ত নতুন নতুন গল্পের সম্ভাবনাও তৈরি হয়। এই ধরো বিদ্যালয় জীবনের শেষ স্তরে এসে, একবার যদি ফিরে তাকিয়ে নিজের শৈশব ও কৈশোরের বিদ্যালয় জীবনের কথা ভাবা হয়, এমন দু'একটা ঘটনা মনে পড়বেই যা গল্পের মতো ফিরে ফিরে আসে। এরকম কোনো একটা ঘটনাকে কেন্দ্রে রেখেই তো গল্প লিখে ফেলা যায়। আবার এমন কোনো ঘটনা-মুহূর্তও গল্পের বিষয় হয়ে উঠতে পারে, যার বয়স হয়ত মাত্র কয়েকদিন। তবে বিদ্যালয় জীবনের ঘটনাহীন দৈনন্দিনতাকেও গল্পের বিষয়বস্তু করে তোলা যায় শুধুমাত্র লেখনীর গুণে। সুতরাং যে কোনো পন্থাই অবলম্বন করা যেতে পারে। কিন্তু ছোটোগল্প লেখার কিছু কৌশল আছে, লেখার সময় সেগুলো খেয়াল রাখতে হবে। কেননা গল্প বিষয়টি অত্যন্ত প্রাচীন হলেও ছোটোগল্প নামক ফর্মটি সাহিত্যের আধুনিক যুগের সন্তান। ছোটোগল্প নিয়ে লেখক ও সমালোচকদের নানা মত রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের 'ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা/ছোটো ছোটো দুঃখকথা/নিতান্তই সহজ সরল; কিংবা পাশ্চাত্য সমালোচকের ভাষায়— 'A short story must contain one and only one informing idea...' প্রভৃতিও হয়ত অনেকে পড়ে থাকবে। কিন্তু ছোটোগল্পের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়ে, আমরা ছোটোগল্প লেখার সময় যে দিকগুলি খেয়াল রাখবো তা একবার সংক্ষেপে স্পষ্ট করে দেখে নিই—

- পরিমিত পরিধির মধ্যে, কয়েকটি সুনির্দিষ্ট চরিত্র ও কোনো একটি কেন্দ্রীয় ঘটনাকে অবলম্বন করে ছোটোগল্প গড়ে ওঠে এবং বিকশিত হয়। বহু চরিত্র এবং বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা গল্পের গতিকে ব্যাহত করে। তাই চরিত্র, ঘটনা ও বিষয় নির্বাচনে বিচক্ষণতা দেখানো প্রয়োজন। আর আবেগ সংহত রেখে বাহুল্যবর্জিত ভাষায় গল্প লেখার চর্চা করতে হবে।

- চরিত্র ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আকস্মিকতা, নাটকীয়তা এবং শেষে এমন এক ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা উচিত; যাতে গল্প পাঠ শেষ হলেও তার রেশ পাঠকের মনে থেকে যায়।

- গল্পের প্রধান গুণ নিহিত থাকে, তার কাহিনি অংশের মধ্যে; তাই নিজের ভাষায় গুছিয়ে কাহিনি লেখার কৌশল অভ্যেস করতে হবে।

- উপস্থাপনা, প্রয়োগ ও কল্পনাশক্তির বৈচিত্র্যে খুব সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা গল্পও অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং সুখপাঠ্য হয়, তাই এইসব দিকগুলোকেও গল্প লেখার সময় মাথায় রাখতে হবে।

- সর্বোপরি স্বরচিত ছোটোগল্প লেখার মতো বিষয়টি আসলে সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টিশীলতার জায়গা। তাই বিভিন্ন পরামর্শ জানা থাকলেও শেষ পর্যন্ত নিজের ভাবনা, কল্পনাশক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং লেখনী-শক্তির উপরেই গল্পের সার্থকতা নির্ভর করবে।

- তুমি স্বাধীনভাবে খোলামনে নিজের ভাষায় এক/একাধিক গল্প লিখে শিক্ষিকা/শিক্ষক মহাশয়ের পরামর্শ নাও। প্রয়োজনে কয়েকবার লেখো। সুযোগ থাকলে বিদ্যালয় পত্রিকা/দেয়াল পত্রিকায় জমা দাও। আরো অনেকের মতামত পাবে। তার ভিত্তিতে নিজের বিবেচনা অনুসারে পরিমার্জন করো এবং শেষে প্রকল্পের গল্প হিসেবে জমা দাও।
- বাংলা সাহিত্যের অনেক প্রথিতযশা লেখক বিদ্যালয় জীবনকে কেন্দ্র করে বহু অসাধারণ গল্প লিখেছেন। আমরা একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম, পড়া না থাকলে, পড়ে দেখো। তারপর নিজের মৌলিক রচনায় হাত দাও।

গল্প	লেখক
পাগলা দাশু	সুকুমার রায়
নন্দলালের মন্দ কপাল	সুকুমার রায়
গিন্নি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জেনারেল ন্যাপলা	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
বন্ধু	পেমেন্দ্র মিত্র
হেড মাস্টার	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
যোগেন পণ্ডিত	বনফুল
নতুন ছেলে নটবর	লীলা মজুমদার
বন্ধু বাৎসল্য	আশাপূর্ণা দেবী
অঙ্ক স্যার, গোলাপিবাবু আর টিপু	সত্যজিৎ রায়
না-পাহারার	পরীক্ষা শঙ্খ ঘোষ
মিস দত্তের ক্লাস	বাণী রায়
মানিকজোড়	সুনির্মল বসু
একটা ইস্কুলের গল্প	বুদ্ধদেব বসু
মুখ দেখে	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
প্ল্যানচেট	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট : দুই

প্রুফ সংশোধন রীতি ও পদ্ধতি
(নির্দেশিকা ও নমুনা)

নির্দেশিকা

নিজের হাতে লেখা যে কোনো রচনাই হলো পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপি যখন ছাপার জন্য পাঠানো হয় তাকে আমরা চলতি কথায় ‘কপি’ বলে থাকি। ছাপাখানায় মুদ্রণের সময়ে বিভিন্ন কারণে (যেমন হাতের লেখার অস্পষ্টতা, বানান সম্পর্কিত অসাবধানতা, অসতর্কতা, ব্যস্ততা ইত্যাদি) প্রায়ই নানারকমের ভুল থেকে যায়। কিন্তু এ ধরনের ভুল থাকা কাম্য নয়।

মুদ্রণের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ভুল সংশোধনের প্রক্রিয়াটির পোষাকি নাম ‘প্রুফরিডিং’। এবার আমাদের জানার বিষয়টি হলো প্রুফ সংশোধনের নির্দিষ্ট রীতি ও পদ্ধতিটি ঠিক কেমন! এরই সঙ্গে কোনো রচনার বিষয় অনুসারে শিরোনাম নির্দেশ এবং অনুচ্ছেদ-বিভাজনের কৃৎ-কৌশলটিও আমাদের শিখে নিতে হবে।

প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে যে যে বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে :

- ভুল বানানগুলিকে চিহ্নিত করে নিয়ে সংশোধন করতে হবে। মান্য বানানবিধি অনুসরণ করে এ কাজটি করতে হবে।
- যতি চিহ্নের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। (যেমন ‘।’, ‘,’‘.’, ‘!’, ‘?’ ‘-’, ‘—’, ‘/’, “/”, ‘:’, ‘:—’ইত্যাদি) কোনো ক্ষেত্রে যতিচিহ্ন বাদ পড়ে থাকলে বা তার ভুল ব্যবহার হয়ে থাকলে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিতে হবে।
- পাণ্ডুলিপির কোনো অংশ প্রুফে বাদ পড়ে থাকলে বা একাধিকবার মুদ্রিত হলে মূল কপিটি দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।
- একই শব্দ বা বাক্য পরপর ছাপা হলে, কোনো ছাপা শব্দের উপরে অন্য শব্দ উঠে গেলে, একই প্রজাতির হরফের সঙ্গে অন্য হরফ জুড়ে গেলে, অক্ষর শব্দে এলোমেলো হয়ে গেলে, কোনো অক্ষর উল্টোভাবে বসলে, দুটি শব্দের মধ্যে অতিরিক্ত বা স্বল্প ফাঁক এসে গেলে, দুটি লাইনের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে, একই শব্দের বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে অনভিপ্রেত ফাঁক রয়ে গেলে, এক পয়েন্টের টাইপের মধ্যে অন্য পয়েন্টের টাইপ বসে গেলে (যে কোনো অক্ষরের আকারকেই বলা হয় Point), প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইটালিক/বাঁকা অক্ষর না বসানো হয়ে থাকলে সব ক্ষেত্রেই সংশোধন জরুরি।
- যে কোনো মুদ্রিত বিষয়ের সৌন্দর্য ও সুসংহত বিন্যাস রক্ষা করার জন্যে উপযুক্ত মারজিন ও পাতার ক্রমাঙ্ক বজায় রাখা প্রয়োজন।
- এ সকল সংশোধনের পাশাপাশি সমগ্র রচনাটিতে বাক্যের গঠনগত বিন্যাসটি ঠিক আছে কি-না তা দেখে নিতে হবে।
- প্রদত্ত বিষয়ের মূল ভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি সহজ আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত শিরোনাম যুক্ত করাও আমাদের কাজের আওতাধীন। এক্ষেত্রে প্রুফ সংশোধনের পর মূল রচনাটি ভালো করে পড়ে নিয়ে তার নির্যাসটুকু চিহ্নিত করে নিতে হবে এবং শিরোনামে তারই প্রতিফলন থাকবে।

- অনুচ্ছেদ বিভাজন বিষয়টি রচনার ভাবের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত একটি গঠনগত দিক। রচনাপাঠে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার ঝোঁক বদলের প্রতি লক্ষ রেখে এ কাজটি করতে হবে। অনুচ্ছেদ বিভাজন যথাযথ হলে রচনার রসগ্রাহিতা যেমন বাড়ে, তেমনই পাঠকের কাছে সহজেই বিষয়বস্তুটি বোধগম্য হয়ে ওঠে।

- ১৯৫৮ সালের ১২ই জুলাই Indian Standard Institute (বর্তমানে Bureau of Indian Standards) প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে যে সর্বজনগ্রাহ্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছেন, তা অনুসরণে তোমাদের কাছে জরুরি কিছু প্রতীক-চিহ্ন দেওয়া রইল ধীরে ধীরে এই কৌশলটি রপ্ত করে নেওয়ার জন্য।

প্রুফ সংশোধনের কৌশল :

⌒/— জুড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে।

trs./— স্থানান্তরিত করার জন্য।

Ital/— বাঁকা অক্ষর বসাতে হবে।

St— কাটা হরফ ঠিক রাখ।

N.P./— নতুন প্যারাগ্রাফ আরম্ভ করার ক্ষেত্রে।

F2/— মোটা অক্ষর (Bold) দিতে হলে।

Run on— এক লাইনে সাজানোর জন্য।

ℓ/— বাদ দিতে হলে।

See Copy —প্রুফে বাদ গেছে। কপি দেখে ঠিক করার নির্দেশের ক্ষেত্রে।

#/— প্রয়োজনীয় ফাঁক রাখার জন্য।

‘/— উদ্ধৃতি চিহ্ন বসানোর ক্ষেত্রে।

,/— কমা বসাও

।/— দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদের জন্য।

Eq#/— ফাঁক সমান করার ক্ষেত্রে।

Less#/— ফাঁক কমানোর জন্য।

ব/— কোনো অক্ষর নীচে বসলে, যেমন—লুব্ধক/সম্বল।

ব/— কোনো অক্ষর উপরে বসালে, যেমন—স্তব্ধ।

F1— সরু হরফ প্রয়োজন।

Pt. up— টাইপ বড়ো করার জন্য।

Pt. down—টাইপ ছোটো করার জন্য।

=— লাইন সমান করতে হলে।

xx/— শব্দ জড়িয়ে গেলে ঠিক করার জন্য।

Caps — ইংরাজিতে ক্যাপিটাল লেটার করার ক্ষেত্রে।

যতিচিহ্নের ক্ষেত্রে :

যথাস্থানে	(।) ʎ	পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন বসাতে হবে।
”	,/ ʎ	কমা চিহ্ন বসাতে হবে।
”	(ঃ)ʎ	কোলন চিহ্ন বসাতে হবে।
”	(;) ʎ	সেমিকোলন চিহ্ন বসাতে হবে।
”	? ʎ	জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসাতে হবে।
”	! ʎ	বিস্ময়বোধক চিহ্ন বসাতে হবে।
”	’ ʎ	অ্যাপসট্রফি (ঊর্ধ্বকমা) চিহ্ন বসাতে হবে।
”	‘ ʎOR’	একক উদ্ধৃতি চিহ্ন বসাতে হবে।
”	“ʎOR ”	ডবল উদ্ধৃতি চিহ্ন বসাতে হবে।
”	… ʎ	উহ্য রাখার চিহ্ন বসাতে হবে।
”	(/) ʎ	স্ট্রোক চিহ্ন বসাতে হবে।
”	(/ OR)ʎ	প্রথম বন্ধনী বসাতে হবে।
”	- ʎ	হাইফেন বসাতে হবে।

নমুনা

প্রুফ :

হেঁয়ালি - নাট্য | 16pt. Heading

ইংরাজিতে এরকম খেলা আছে, তাকে বলে, 'শ্যারাড' (Sharade)। এ খেলা দেখতে হলে এমন কয়েকটি লোক দরকার যারা অন্তত একটু-আধটু অভিনয় করতে পারে। তারপর এ মন একটি কথা নিয়ে অভিনয় করতে হবে, যাকে ভাগ করলে দু-তিনটা কথা হয়, যেমন Handsome (Hand ও some বা Sum) অথবা Carpet (Car বা Cur ও pet)। অভিনয়ের প্রথম দৃশ্যে কথার প্রথম অংশটি, দ্বিতীয় দৃশ্যে দ্বিতীয় অংশটি, তৃতীয় দৃশ্যে সমস্ত কথাটি বুঝিয়ে দিতে হবে; যাঁরা দর্শক থাকবেন তাঁরা সব দেখেশুনে বলবেন, কোন কথাটি নিয়ে অভিয়নি করা হলো। যদি কোনো কথার যদি কোনো কথার তিনটি অংশ থাকে—যেমন হাঁস পা-তাল, তা হলে অবশ্য চারটি দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে। বাংলাতেও 'শ্যারাড' বা 'হেঁয়ালিনাট্য' হতে পারে একটা বাংলা দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় কথাটা পরিষ্কার হয়। মনে করো বৈঠক কথাটা নিয়ে অভিনয় হচ্ছে। প্রথম দৃশ্য—'বই'। একজন লোক দিনরাত খালি বই নিয়ে ব্যস্ত, কেবলই বই পড়ছে চারিদিকে তার রাশি রাশি বই ছড়ানো রয়েছে দেখে বিরক্ত হয়ে বলছে, "তোমারও ও পোড়া বইগুলো একটু হাওয়া খেয়ে একবার নরুবাবুর বৈঠকে যাই" লোকটি অগত্যা রাজি হয়ে বলল,

"আচ্ছা, তোমরা এগোও, আমি এইটা শেষ করেই আসছি।"

দ্বিতীয়দৃশ্য—'ঠক'। একটি ছোট্ট বইয়ের দোকান, তার সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বইওয়ালাকে ভীষণ গালাগালি দিচ্ছেন। বলছেন, "চোর বাটপাড় ঠক জোচ্চর, আগাম টাকাটা নিয়ে এখন বই দেওয়ার বেলায় ফাঁকি দিচ্ছ।" বইয়ালা বলে, "সে কী মশাই। কার কাছে টাকা দিলেন? ভদ্রলোক চুটমটে খুব খানিক শাসিয়ে চলে গেলেন। এমন সময়ে সেই বই-পড়া লোকটি এসেছে; বইওয়াল তাকে একটি বহুকালের পুরনো পুঁথি দেখাল—তার অনেক দাম। লোকটি বইখানা কিনে বলল, "বইটা একটু কাগজে জড়িয়ে বেঁধে দাও তো।" বইওয়ালা "দিচ্ছি" বলে বইখানা নিয়ে তার বদলে কতগুলো বাজে বটতলার বই বেঁধে দিয়ে বলল, "এই নিন মশাই।" বই-পড়া লোকটি তখন হাঁ করে অন্য বই দেখছিল, সে কিছুই টের পেল না, বইয়ের প্যাকেট নিয়ে চলে গেল।

সংশোধিত রূপ :

হেঁয়ালি-নাট্য

ইংরাজিতে একরকম খেলা আছে, তাকে বলে, 'শ্যারাড' (Charade)। এ খেলা দেখতে হলে এমন কয়েকটি লোক দরকার যারা অন্তত একটু-আধটু অভিনয় করতে পারে। তারপর এমন একটি কথা নিয়ে অভিনয় করতে হবে, যাকে ভাগ করলে দু-তিনটা কথা হয়, যেমন Handsome (Hand ও Some বা Sum) অথবা Carpet (Car বা Cur ও Pet)। অভিনয়ের প্রথম দৃশ্যে কথার প্রথম অংশটি, দ্বিতীয় দৃশ্যে দ্বিতীয় অংশটি, তৃতীয় দৃশ্যে সমস্ত কথাটি বুঝিয়ে দিতে হবে; যাঁরা দর্শক থাকবেন তাঁরা সব দেখেশুনে বলবেন, কোন কথাটি নিয়ে অভিনয় করা হলো। যদি কোনো কথার তিনটি অংশ থাকে—যেমন হাঁস পা-তাল, তা হলে অবশ্য চারটি দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে। বাংলাতেও 'শ্যারাড' বা 'হেঁয়ালি নাট্য' হতে পারে; একটা বাংলা দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় কথাটা পরিষ্কার হয়। মনে করো 'বৈঠক' কথাটা নিয়ে অভিনয় হচ্ছে।

প্রথম দৃশ্য—'বই'। একজন লোক দিনরাত খালি বই নিয়ে ব্যস্ত, কেবলই বই পড়ছে। তার চারিদিকে রাশি রাশি বই ছড়ানো রয়েছে দেখে বিরক্ত হয়ে বলছে, ''তোমারও ও পোড়া বইগুলো একটু রাখো দেখি। চলো একটু হাওয়া খেয়ে একবার নরুবাবুর বৈঠকে যাই।'' লোকটি অগত্যা রাজি হয়ে বলল, ''আচ্ছা, তোমরা এগোও, আমি এইটা শেষ করেই আসছি।''

দ্বিতীয় দৃশ্য—'ঠক'। একটি ছোট্ট বইয়ের দোকান, তার সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বইওয়ালাকে ভীষণ গালাগালি দিচ্ছেন। বলছেন, ''চোর বাটপাড় ঠক জোচ্চোর, আগাম টাকাটা নিয়ে এখন বই দেওয়ার বেলায় ফাঁকি দিচ্ছ।'' বইওয়ালা বলে, ''সে কী মশাই! কার কাছে টাকা দিলেন?'' ভদ্রলোক চটেমটে খুব খানিক শাসিয়ে চলে গেলেন। এমন সময়ে সেই বই-পড়া লোকটি এসেছে; বইওয়ালা তাকে একটি বহুকালের পুরনো পুঁথি দেখাল—তার অনেক দাম! লোকটি বইখানা কিনে বলল, ''বইটা একটু কাগজে জড়িয়ে বেঁধে দাও তো।'' বইওয়ালা ''দিচ্ছি'' বলে বইখানা নিয়ে তার বদলে কতকগুলো বাজে বটতলার বই বেঁধে দিয়ে বলল, ''এই নিন মশাই।'' বই-পড়া লোকটি তখন হাঁ করে অন্য বই দেখছিল, সে কিছুই টের পেল না, বইয়ের প্যাকেট নিয়ে চলে গেল।